MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

রিজার্ভ সংকট এবং আইএমএফের ঋণ

রিজার্ভ নিয়ে সাফল্য প্রচারের সাথে সাথেই যেন আতঙ্ক গ্রাস করেছে। যেহেতু খাদ্য, সার, জ্বালানি, মেশিনপত্র, গাড়ি ইত্যাদি আমদানি করতে হয় এবং দেশি-বিদেশি ঋণ ও সুদ শোধ করতে হয় তাই রিজার্ভ কমছে প্রতি মাসে। সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় আইএমএফের কাছে গত জুলাইয়ে ৪৫০ কোটি ডলার বা ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ। ঋণ নিয়ে আলোচনা করতেই সংস্থাটির প্রতিনিধি দল এসেছে ঢাকায়। সংস্থাটির এশীয় ও প্যাসিফিক বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দের নেতৃত্বাধীন একটি দল গত ২৬ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে এবং তিনটি বেসরকারি সংস্থার সাথে বৈঠক করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সোমবার তিনটি আলাদা বৈঠক করেছে আইএমএফের দল। সেসব বৈঠকে ভর্তুকি কমানোসহ আইএমএফের নানা ধরনের শর্ত ও আলোচনার কথা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আইএমএফের সফররত দলটি সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রকৃত খরচের প্রবণতা জানতে চেয়েছে। তারা আরও জানতে চেয়েছে জ্বালানি তেলসহ বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাসে দেওয়া ভর্তুকি ও লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী? এ বছরের বাজেটে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ আছে। ভর্তুকির বেশির ভাগ টাকাই ব্যবহৃত হবে জ্বালানি তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের জন্য। আইএমএফ অবশ্য ভর্তুকি কথাটি বলতে চায় না। ভর্তুকিকে 'ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা' বলে থাকে তারা। ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় নগদ ঋণ নামে খাতের উল্লেখ করা হয়, আসলে শেষ বিচারে এটা ভর্তুকিই। এ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ইত্যাদি সংস্থাকে। ধরে নেওয়া হয় এগুলো অফেরতযোগ্য ঋণ এবং বিপিসি ও পিডিবি সরকারকে তা ফেরত দেয় না, সরকারও ফেরত চায় না। বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার জন্য পিডিবিকে ঋণ দেয় সরকার। এগুলো নামে ঋণ কিন্তু বাস্তবে ভর্তুকি। কারণ, সরকার এই টাকা ফেরত পায় না। জনগণের ট্যাক্সের টাকা চলে যায় সরকারের হাত হয়ে ব্যবসায়ীদের পকেটে।

গত অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের লোকসান পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। পিডিবির পাশাপাশি লোকসানি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি), বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিণ্টউটিসি), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন র্কতৃপক্ষ (বিআইডব্লিণ্টউটিএ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)।

সংস্থাগুলো বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে যাচ্ছে আর তা মেটানো হচ্ছে জনগণের করের টাকায়। আইএমএফ বলেছে, এ লোকসান কমিয়ে আনার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং ধীরে ধীরে এদের কয়েকটিকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে। যে দুর্নীতির ফলে লোকসান হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কথা নেই, কিন্তু বেসরকারিকরণের নামে লুটপাট ও শোষণকে সুযোগ করে দেওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্য।

চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার কথা বলা আছে। এ বরাদ্দ থেকেই রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও শিক্ষা খাতের অংশ। আইএমএফ অর্থ বিভাগকে বলেছে, এ দুই খাতের ব্যয়গুলো যথাযথ করতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং প্রকৃত উপকারভোগী যেন সহায়তা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

ভর্তুকি কমিয়ে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পর মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ালে কি তা আরও বেড়ে যেত না–এই প্রশ্নের জবাবে আইএমএফের প্রস্তাবের পক্ষে অনেকে বলছেন, 'এখন যে সরকার খরচ মেটাতে পারছে না, তার চেয়ে মূল্যবৃদ্ধি ভালো। দুটি বিকল্প আছে, 'বিদ্যুৎ চাই না, নাকি বেশি দামে চাই'। তাদের ধারণা অনেকেই বলবেন যে, বেশি দামে হলেও বিদ্যুৎ চাই। তার অর্থ জনগণকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হবে। সারের ভর্তুকি কমানোর পক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন, 'রাসায়নিক সার এত সস্তা না হলে জৈব সারের একটা বড় বাজার তৈরি হতো। ভর্তুকি কমিয়ে আমাদের সে পথে যেতে হবে।' বাস্তবে এর ফলে কৃষি, কৃষক ও ভোক্তা কী সমস্যায় পড়বে সে বিষয়ে কোনো ভাবনা নেই।

লোকসানি সংস্থাগুলো প্রসঙ্গে সাধারণ যুক্তি হচ্ছে, বোঝাগুলো ঘাড় থেকে নামানো দরকার। পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কিছু লোক বসে সুবিধা ভোগ করেন। এ ছাড়া এগুলোর কোনো দরকারই নেই। সাধারণভাবে এ কথা শুনতে ভালো এবং এটা তো চোখেই দেখছেন সবাই। কিন্তু এর ভেতরের কারণ কী? কেন লোকসান হয়, কোন নীতি অনুসরণ করার কারণে লোকসান হয় আর সংস্থাগুলো লোকসান করলেও কর্তাব্যক্তিদের সম্পদ বাড়ে কেন, লোকসানি সংস্থা বিক্রি করলে কারা কেনেন সেসব, তাদের পরিচয় কী আর তারা কেনার পর কী করেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করলে দেখা যাবে একটা চক্রাকার কাজ চলছে। জনগণের সম্পদকে লোকসানি বানাও, সেসব বিক্রির মতামত তৈরি করো, ভাগ্যবান ক্রেতা নির্ধারণ করো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ দাও, ঋণের টাকা শোধ না করেও তারা দাপটের সঙ্গে চলতে পারবেন এমন ব্যবস্থা করে দাও, এ ধরনের চক্রে আবর্তিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেচাকেনার কাজ। দেশের ঘাড় থেকে লোকসানের বোঝা নামানোর নামে নতুন করে খেলাপি ঋণের বোঝা কাঁধে নিচ্ছে দেশ।

দেশে দীর্ঘদিন ধরে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কথা বলা হলেও সরকার তাতে কান দেয়নি কখনো। জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সোয়া লাখ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৯ শতাংশ। আইএমএফ এই হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছে। ঋণের শর্ত হিসেবে নতুন করে এ বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে আইএমএফ। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিও বেশ জোরেশোরে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব নিয়ে। ভুল শ্রেণিকরণের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের আকার বড় হয়েছে বলে দাবি করে আইএমএফ। ২০২১ সালে আইএমএফ বলেছিল, চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে বাংলাদেশে ৪৬ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ থাকার যে কথা বলা হয়েছিল, তা আসলে ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে বলা হয়েছে। রিজার্ভ বহির্ভূত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করে রিজার্ভ ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এবার ঋণ নিয়ে আলোচনা করতে এসে আইএমএফ কর্মকর্তারা বেশ জোরালোভাবেই এ বিষয়টি তুলে ধরে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের শর্ত হিসেবেই যুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে এখন থেকে আইএমএফের কাছে তথ্য পাঠানোর সময় প্রকৃত রিজার্ভের তথ্য পাঠাতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এক বছর আগে দেশে রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের বেশি। নানা খাতে খরচ করার পর তা এখন কমে হয়েছে ৩ হাজার ৫৮৫ কোটি (৩৫.৮৫ বিলিয়ন) ডলার। রিজার্ভ থেকে ৭ বিলিয়ন দিয়ে গঠন করা হয়েছে রপ্তানিকারকদের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)। আবার রিজার্ভের অর্থ দিয়ে গঠন করা হয়েছে লং টার্ম ফান্ড (এলটিএফ) ও গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)। বাংলাদেশ বিমানকে উড়োজাহাজ কিনতে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে রিজার্ভ থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আবার পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের খনন কর্মসূচিতেও রিজার্ভ থেকে অর্থ দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এসব খাতে সব মিলিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে ৮ বিলিয়ন ডলার, যা খরচ হয়েছে তা বাদ দিয়েই তো রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব করতে হবে। কারণ এসব অর্থ

চাইলেই ফেরত পাওয়া যাবে না। এমনকি জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। এই বিবেচনায় বর্তমানে রিজার্ভ কমে হয় ২৭ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। আর চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর তা নেমে আসবে ২৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে। সেপ্টেম্বরে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। যদি অন্য কোনো বড় ঘটনা না ঘটে তাহলে এই রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের কিছু বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি দেশের কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ রিজার্ভ থাকতে হয়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ কিছুটা ঝুঁকিতে আছে। তাই ডিসেম্বরের মধ্যে আইএমএফের সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রথম কিস্তির দেড় বিলিয়ন ডলার পাওয়ার জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে সরকার। আর সেটা বুঝতে পেরে আইএমএফের প্রতিনিধিদল মুদ্রানীতির কাঠামো পরিবর্তন করতে বলেছে। আইএমএফ পরামর্শ দিয়েছে বছরে দুবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করার। এরপর বছরে চারবার ঘোষণা করতে বলেছে। প্রতিনিধিদলটি মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হারের ওপর জোর দিয়েছে। প্রবাসী আয়ের ওপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা তুলে দিয়ে ডলারের দাম আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেয়। এতে প্রবাসী আয় বাড়বে বলে মনে করে সংস্থাটি।

তিন বছরে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ পেতে কেন এসব শর্ত মেনে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। কারণ কঠিন এ সময়ে আইএমএফের ঋণ পাওয়া গেলে অর্থনীতির ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা সামাল দেওয়া যাবে এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়া সহজ হবে।

আইএমএফ যেসব কথা বলছে বা যেসব শর্ত দিচ্ছে তার কোনোটিই কিন্তু নতুন নয়। বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর যেখানেই এরা ঋণ দেয় সেখানেই এসব শর্ত আরোপ করে, খবরদারি করে, পরামর্শের নামে কর্তৃত্ব করে। দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার ফলে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয় তা পোষানোর নামে আবার ঋণের জালে আটকে ফেলার কৌশলে বাঁধা পড়ে যাবে কি দেশ?